আব্দুল বায়েস

বাংলাদেশের আগামী রূপান্তরের রূপরেখা

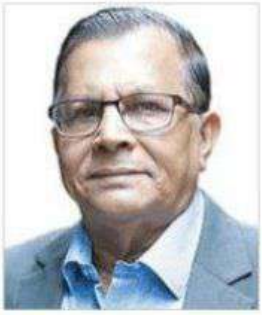

এক. ছোটবেলায় শুনতাম অমুকের মতো হও, তমুকের মতো হতে নেই। কলেজে পা ফেলে দেখি কেউ মহানায়ক উত্তম কুমারের মতো চুল ছাঁটে, কেউ নায়িকা মধুবালা কিংবা নার্গিসের মতো করে হাসতে গিয়ে হাসির খোরাক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে দেখি পিকিং, মস্কো, ওয়াশিংটনপন্থীদের প্রচণ্ড পদচারণ; বাঙালিপন্থীও ছিল পাশাপাশি। পেশাজীবনে পেলাম বাংলাদেশের প্রতি পরামর্শ—দক্ষিণ এশিয়ার দেশের মতো হও। এর কথা ওর কথা শুনতে শুনতে নীতিনির্ধারকদের অবস্থা মান্না দের গাওয়া সেই বিখ্যাত গানের মতো, 'আমি কোন পথে যে চলি, কোন কথা যে বলি/ তোমায় সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরা গলি/ সেই গলিতেই ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি, বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি।'

দুই. আগামী এক দশকের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং দুই দশকের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ এগোচ্ছে—অন্তত সরকারি পরিকল্পনায় ও ধীমানদের ধ্যান-ধারণায় এমন ইঙ্গিত মেলে। সন্দেহ নেই যে লক্ষ্যগুলো প্রেরণাদায়ক, তবে উদ্দীপ্ত উদ্দেশ্যে পৌঁছতে নির্দিষ্ট পথগুলো পরিষ্কারভাবে জানান দেয়া দরকার। এই ক্রান্তিকালের করণীয় হিসেবে আরো দরকার অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং বাংলাদেশের নিজস্ব 'মডেলে'র ওপর ভর করে সামনের সমস্যাসংকুল পথ পাড়ি দেয়া।

সম্প্রতি বিআইডিএস আয়োজিত এবিসিডি কনফারেন্সে এমনটাই বললেন প্রখ্যাত প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তার মতে, বাংলাদেশের আগামী স্বপ্ন পূরণ করতে বাংলাদেশভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আজকের নিবন্ধ তার বক্তব্যের নির্যাস হিসেবে নিবেদিত।

তিন. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিবিষয়ক অধ্যয়ন স্বীকার করে নিয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন একটা সাধারণ ঘটনা হলেও টেকসই হওয়াটা ব্যতিক্রম। তাই উপলব্ধ উল্লাস উদযাপনের আগে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে উন্নয়নের বিদ্যমান ব্যাখ্যায় 'এশিয়ার উদীয়মান বাঘ'-এর মতো হওয়ার অবারিত উপদেশ অহর্নিশ আসতে থাকল। অবস্থা অনেকটা যেন ১৯৬৫ সালে রক ব্যান্ড 'বিচ' কর্তৃক গাওয়া একটা গানের মতো, 'ওরা সবাই যদি ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে হতো।'

কিন্তু সবাই তা হয় না। শুধু তা-ই নয়, সম্ভবত অধিক সময় ব্যয় করা হয়েছে এমনতর 'উপচিত' উপদেশ উদ্‌গিরণে এবং এর বিপরীতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে জাপানের অভিজ্ঞতা সিঞ্চনে। এ দেশটি ১৯০০ সালে আর্জেন্টিনার সমান মাথাপিছু আয় নিয়ে আকাশচুম্বী উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ চীন হয়তো অনুকরণীয় মডেল হতে পারত কিন্তু বাজার অর্থনীতি আলিঙ্গনের পর থেকে দেশটিতে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে অসমতা-আয়বৈষম্য। এখন বিদিশায় পড়া দেশটি বড় বড় ব্যবসা দমন করতে উঠেপড়ে লেগেছে, অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীত জাপানের অভিজ্ঞতা। শ্রমিকদের কল্যাণ ও আনুগত্যের মিলন ঘটিয়ে—যাকে বলে 'জাপানের মূল্যবোধ'—জাপানের ব্যবসায়িক মডেল প্রবৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ন্যায়সংগত রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর সেজন্যই বোধহয় জাপানে ধনী লোক বেশি কিন্তু বিলিয়নেয়ার হাতেগোনা কয়েকজন (আমেরিকার ৬৭৫ এবং ভারতের ১৭৫-এর বিপরীতে মাত্র ২৫!)। সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশে যত উচ্চ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তত বিলিয়নেয়ার বাড়ছে; বিলিয়নেয়ার নিয়ে অসম প্রবৃদ্ধির পথে হাঁটছে বাংলাদেশ।

পাঁচ. সফলতার সব গল্পে অবশ্য কিছু মিল পাওয়া যায়, যেমন লিও তলস্তয় বলেছেন, 'সুখী পরিবার সব একই রকম।' মিলটা হলো, একটা কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা; যা অর্থনৈতিক উদ্যোগ উৎসাহিত করবে। এই 'সহায়ক পরিবেশ' দেশভেদে ভিন্নতর হতে পারে, তবে আমাদের কাছে মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন—বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এমন উপাদান কী হতে পারে?

প্রথমত, এলডিসি-পরবর্তী জমানার চ্যালেঞ্জ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত কালের প্রাধিকারমূলক প্রাপ্তি ছাড়া কেমন করে দেয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দরকষাকষি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা যায়, তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে এবং তা এখন থেকেই। কেউ হাত-পা গুটিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে ভাবলে ভুল হবে, বরং আমাদের বাণিজ্য অংশীদাররা যার যার মতো করে এক বা একাধিক আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দৌড়ঝাঁপ লেগে গেছে দোর খুলে দেয়ার জন্য। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় প্রবেশের পথ বড় কঠিন, যেমন সময়ের দিক থেকে দীর্ঘ, তেমনি এর জন্য বিশেষজ্ঞের মূল্যবোধ ধারণ প্রয়োজন। আরেকটা কথা, আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের অন্তর্দৃষ্টি ভালো এমন একটা ভুল ধারণার ওপর ভর করে অনেক সময় সরকার নিষ্কপট নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এ গোষ্ঠীর ওপর। কিন্তু যেকোনো মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার ফলে বিরাজমান ব্যবসায়ীদের কেউ লাভবান কিংবা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এটাই নিয়ম। যখন সব ব্যবসায়ী একযোগে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে হাত ওঠান তখন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বলে, প্রস্তাবিত সেই মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা আলোর মুখ দেখতে পায় না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের জন্য অন্য একটা বিশেষ দিক হচ্ছে প্রকট ভূমিস্বল্পতা। দ্বীপদেশ সিঙ্গাপুর ছাড়া আবাসন আর উৎপাদনের বাইরে যে জায়গা আছে তা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। বস্তুত, পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে বিদ্যমান কৃষিজমি, বন ও জলাধারের মতো অন্যান্য পরিবেশিক সম্পদের ওপর অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন গড়ে তোলা বেজায় কঠিন কাজ। উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে যেতে পারলে তো চ্যালেঞ্জ তীব্রতর হওয়ার কথা। এমন সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের উচিত হবে পরিবেশবান্ধব ভূমি ব্যবস্থায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে শিল্পোন্নত দেশের চেয়েও বেশি জিডিপি উৎপাদন করার পথ বের করা, যার জন্য অবশ্য প্রচুর গবেষণা দরকার।

তৃতীয়ত, ঢাকা শহরের মতো মেগাসিটিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একে অন্যকে সাহায্য করার তথা এগলোমারেসনের

> সুখবর যে বাংলাদেশে জনমিতিক রূপান্তর ঘটেছে একটু আগেভাগেই, ফলে জনমিতিক কাঠামোয় যুবস্ফীতির মাধ্যমে পাওয়া জনমিতিক সুফল সঞ্চারিত হয়ে বর্তমান প্রসারমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রসাদ হাতের নাগালে

সুফল যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পরিবেশ দূষণের এবং ব্যয়বহুল নাগরিক সুবিধা প্রদানের কুফল। এখানে অবশ্য সুফলের চেয়ে কুফলের কর্তৃত্ব অনেক বেশি বলেই যত বিপত্তি। শহরের এই গাদাগাদি অবস্থাকে সহনীয় করে তুলতে প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৌশল, যেখানে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে। পুরো দেশ নগরসম আবাসভূমিতে রূপান্তর হলে দূরবর্তিতা দূর হবে, নিবিড় সংযোগ সাধন সাপ্লাই চেইন গড়ে উঠবে এবং এমনি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মেগাসিটির মতো এগলোমারেসন সুবিধা পাবে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের উচিত হবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মতো ডেনসিটি ডিভিডেন্ড ঘরে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

এ ধরনের ব্যাপনস্থল বিচ্ছুরিত উন্নয়নের জন্য তথা অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় সঞ্চারণে পরিকল্পিতভাবে উন্নত ভৌত অবকাঠামোর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন সন্দেহ নেই, তবে তার সঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ ভালো রাখার জন্য যথাযথ নীতিমালা থাকা দরকার। যমুনার ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাশিত শিল্পায়ন ঘটাতে পারেনি নানা কারণে, যেমন ল্যান্ড লকড অঞ্চল; তবে সাগরের সীমানা ধরে পদ্মা সেতুর সুফল ঘরে তুলতে চাই পরিকল্পিত পদক্ষেপ। স্মর্তব্য, এ ধরনের মেগা প্রকল্প তখনই প্রবৃদ্ধিবান্ধব হয় যখন তা অধিকতর ব্যক্তি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বিশেষত রফতানিমুখী এফডিআই প্রবাহের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রকল্পগুলোর কারণে নেয়া 'সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট' লেনদেন ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।

এটা আবার অর্থনৈতিক পরিচালন পদ্ধতি ও ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নীতকরণের সঙ্গে গভীর সূত্রে গ্রথিত। অর্থনীতিবিদ আখতার মাহমুদ সম্প্রতি এক লেখায় যথাযথভাবে বাজারবান্ধব পরিবেশ ও আপাতদৃষ্টে ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন; প্রথমটি বাজার প্রতিযোগিতা ও দক্ষ ব্যবসায়কে উৎসাহিত করে আর দ্বিতীয়টি উচ্চ সুরক্ষা দিয়ে নির্বাচিত অনুগ্রহভাজন ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেয়। দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা একসময় সহজেই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমে অধঃপতিত হতে পারে। যেমনটি বাংলাদেশে ঘটেছে বলে অনেকের অভিযোগ।

চতুর্থত, বাংলাদেশের শাসন বা গভর্ন্যান্স বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। বিষয়টি জটিল, তবে সাম্প্রতিক একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। অর্থনীতিবিদরা এখন ভালো করেই বুঝে গেছেন যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লালনে বাজারের কার্যকারিতা এবং বাজার ব্যবস্থার ভূমিকা নির্ভর করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচরণগত নৈতিক নিয়মের ওপর। বস্তুত, এগুলো মিলে হচ্ছে অবকাঠামো, বলা চলে সামাজিক পুঁজি, যার মধ্যে বাজার অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। গভর্ন্যান্সের যেসব নির্দেশক নিয়ে আমরা সচরাচর নাড়াচাড়া করি, সেগুলো মূলত সংগঠিত গভর্ন্যান্স কাঠামোয় অবস্থান নেয়া পদ্ধতিগত ও কার্যকরীকরণ সমস্যা, যেমন দুর্নীতি দমনে নীতি সংস্কার, মৌলিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সম্পত্তি অধিকার সংরক্ষণ অথবা আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণ ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে এরা বিদ্যমান উচ্চ ব্যবসায়িক ব্যয় কমিয়ে আনতে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তা এই যে, যদি আমরা না জানি কীভাবে বিচ্যুত ব্যবহার জন্ম নেয় এবং কীভাবে আচরণগত নিয়মগুলো সংগঠিত হয়, সেক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাসে গৃহীত এসব প্রশাসনিক সংস্কার কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এমনকি বাজার নিয়ন্ত্রক ও বিবেকহীন ব্যবসায়ীর মধ্যকার অশুভ গোপন সহযোগিতা ব্যাখ্যায়ও তার প্রয়োজন আছে।

সামাজিক ব্যবহারিক নিয়মাবলি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নগর পরিবেশের বাইরে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন অপেক্ষাকৃত নমনীয়। মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ অর্থনীতির বড় চালিকাশক্তি হচ্ছে ক্ষুদ্র খামারবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের 'স্কেলিং আপ'-এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণ এবং গ্রামের প্রায় নগররূপ ধারণ। মূলত অসংগঠিত এ অর্থনীতির বিস্তার লাভের পেছনে কাজ করেছে সনাতন ব্যবহারিক নিয়ম, বিশ্বাস, সহযোগিতা, পারস্পরিক বিনিময় ও নৈতিক নিয়ম; যা সময়ের বিবর্তনে বিকশিত হয়ে আসছে। বর্তমান কালের বিপদ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন কারণে বাজার অর্থনীতির এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবকাঠামোটি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, যেমন রাজনৈতিক মেরুকরণ, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংঘাত এবং গ্রামের বিশ্বস্ত বয়স্কদের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল দলীয় ক্যাডারদের আধিপত্য ইত্যাদি।

সব শেষে 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ড' হচ্ছে বেশকিছু সামাজিক নির্দেশকে বাংলাদেশের চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি, যার ফলে দেশটি পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকে তুলনীয় দেশের অগ্রভাগে স্থান নিয়েছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ গণনীতি বিষয় হচ্ছে কীভাবে এ অর্জন সুসংহত করে আরো অগ্রগতি সাধন করা যায়, যেমন অধিকতর গণব্যয় এবং একই সঙ্গে উন্নত সেবা প্রদান। মনে রাখতে হবে এ পর্যন্ত কম ব্যয়ের সমাধান ও গণসচেতনতা প্রচার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ফলে সরকারি খাতের সরবরাহ পদ্ধতির দক্ষতার বিষয়টি পাশ কাটানো গেছে। অন্তত করোনা এসে ওয়েকআপ কল দিয়ে বুঝিয়ে দিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ভালো নয়।

আরেকটা কথা, জনকল্যাণে সামাজিক খাতের উন্নয়ন নির্দেশকের ভূমিকা ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের অধিকতর দৃষ্টি দেয়া উচিত হবে এ অর্জন ও দেশের অর্থনৈতিক কৃতিত্বের মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিতে। মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি আর পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের মধ্যকার সংযোগ নিয়ে গবেষণাপ্রসূত প্রমাণ আছে, কিন্তু এ প্রমাণও আছে যে মাধ্যমিক পাস করা গ্র্যাজুয়েট অনেকে বেকার থাকছেন অথবা তাদের দক্ষতার উপযোগী তেমন কাজ নেই বলে। সুতরাং চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে বর্ধনশীল শ্রমশক্তির যথেষ্ট দরকারি দক্ষতা ও সক্ষমতা সৃষ্টি করা কিংবা তাদের দক্ষতা সাপেক্ষে যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি করা।

সুখবর যে বাংলাদেশে জনমিতিক রূপান্তর ঘটেছে একটু আগেভাগেই, ফলে জনমিতিক কাঠামোয় যুবস্ফীতির মাধ্যমে পাওয়া জনমিতিক সুফল সঞ্চারিত হয়ে বর্তমান প্রসারমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রসাদ হাতের নাগালে। তবে সুযোগের জানালাগুলোর সঠিক ব্যবহার ঘটিয়ে আরো দুই দশক পার করতে পারলে বাঁচোয়া, কারণ এর পর থেকে বার্ধক্যজনিত কারণে শ্রমশক্তির সরবরাহ ধীরে ধীরে নিম্নগামী হবে। ব্যক্তির বেলায় যা, দেশের বেলায়ও তা সত্য—বৃদ্ধ হওয়ার আগে ধনী হতে হবে। ঘটনাক্রমে বলতে হয়, সরকারি লক্ষ্য অনুযায়ী যে বছর বাংলাদেশের ধনী দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে, সে বছরই জনমিতিক সুফলের যুগ শেষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।'

এই ছিল আগামী এক থেকে দুই দশকে বাংলাদেশের রূপান্তরে প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সোজাসাপ্টা প্রেসক্রিপশন, যা মানলে হয়তো সুখী বাংলাদেশ গড়া যাবে।

'সুখী হওয়া খুব সোজা কিন্তু সোজা হওয়া খুব কঠিন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আব্দুল বায়েস: অর্থনীতির অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক